ইউনিট-২

বীজ ও শস্য সংরক্ষণ

ভূমিকা

ফসল উৎপাদনের জন্য অন্যতম মৌলিক উপকরণ বীজ। বীজ ভালো না হলে কোন ভাবেই ভালো ফলন আশা করা যায় না। এ দেশের আবহাওয়া ফসল উৎপাদনের জন্য যেমন সহায়ক তেমনি বিভিন্ন প্রকার আপদের জন্যও অনুকূল প্রভাব ফেলে থাকে। এই ক্ষতিকর আপদ অর্থাৎ পোকামাকড়, রোগ বালাই, আগাছা, ইঁদুর, শিয়াল, পাখি প্রভৃতির আক্রমন জনিত ক্ষয়ক্ষতি থেকে ফসল রক্ষা করা এবং তাদের বংশবিস্তার বাঁধা প্রদান করাকে শস্য সংরক্ষণ বলা হয়। এ ইউনিট পাঠ শেষে আপনি বীজের সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য, শ্রেণীবিভাগ, বীজ উৎপাদন কৌশল, সমন্বিত বালাই দমন ব্যবস্থাপনা, ইদুর দমন প্রভৃতি সম্পর্কে ধারণা লাভ করবেন।

পাঠ ২.১ : বীজ, বীজের বৈশিষ্ট্য ও শ্রেণীবিভাগ

এ পাঠ শেষে আপনি–

- বীজের সংজ্ঞা দিতে পারবেন।
- ভালো বীজের বৈশিষ্ট্য বলতে পারবেন।
- বীজের শ্রেণীবিভাগ উল্লেখ করতে পারবেন।

বীজের ধারণা

উদ্ভিদের বংশবিস্তারের অন্যতম মাধ্যম হলো বীজ। উদ্ভিদ যৌন পদ্ধতিতে বীজের মাধ্যমে অথবা অযৌন পদ্ধতিতে কোন অঙ্গজ অংশের মাধ্যমে বংশবিস্তার করে। বীজের সংজ্ঞা দু'রকম হতে পারে।

প্রথমত : উদ্ভিদতাত্ত্বিক বিবেচনায় নিষিক্ত পরিপক্ব ডিম্বককে বীজ বলে। যেমন– ধান, গম, পেঁপে।

দ্বিতীয়ত ঃ কৃষিতাত্ত্বিক বিবেচনায় উদ্ভিদের শারীরিক বা জাননিক অঙ্গ উপযুক্ত পরিবেশে আপন জাতের নতুন উদ্ভিদের জন্ম দিতে পারে, তাকে কৃষি বীজ বলে। যেমন– আদা ও হলুদের কন্দ, মিষ্টি আলুর লতা, পাথরকুচির পাতা, ফুল গাছের শাখা–প্রশাখা ইত্যাদি।

ভালো বীজের বৈশিষ্ট্য

১। ভালো বীজ পরিষ্কার থাকবে। এতে ধুলো বালি, ময়লা, আগাছা বা অন্য কোন ফসলের বীজ মিশানো থাকবে না।

২। ভালো বীজ পুষ্ট, সুপরিপক্ব,সজীব ও অধিক তেজসম্পন্ন হবে।

৩। বীজের রং উজ্জ্বল থাকতে হবে অর্থাৎ জাতের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্বাভাবিক বর্ণ থাকতে হবে।

৪। ভালো বীজ অবশ্যই পোকামাকড় আক্রমণমুক্ত হতে হবে।

৫। ভালো বীজ অবশ্যই রোগজীবাণু মুক্ত হতে হবে।

৬। ভালো বীজ কৌলিতাত্ত্বিক দিক থেকে বিশুদ্ধ থাকবে (Genetic purity) অর্থাৎ বীজ উৎপাদনে জাতের বিশুদ্ধতা অপরিহার্য। তাই একই জাতের বীজের মধ্যে অন্য জাতের মিশ্রণ দূষণীয়।

৭। বীজের অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা (>৮০%) বেশি হবে। অনুকূল পরিবেশ অর্থাৎ পরিমিত পানি, অক্সিজেন, তাপ ও আলোর উপস্থিতিতে বীজের ভ্রূণ সক্রিয়ভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে বীজত্বক ভেদ করে বেরিয়ে এসে কচি চারা গাছ উৎপাদন করার প্রক্রিয়াকে বীজের অঙ্কুরোগম বলে।

৮। বীজের আর্দ্রতা ৪-১২% এর নিচে থাকতে হবে।

৯। বীজে সমরূপিতা থাকবে অর্থাৎ সকল বীজের আকার–আকৃতি প্রায় একই রকম হলে ভালো হয়।

বীজের শ্রেণীবিভাগ

বিভিন্নভাবে বীজের শ্রেণীবিভাগ করা যায়। নিম্নে কয়েকটি উল্লেখ করা হলো।

বীজপত্রের সংখ্যা অনুসারে

১। একবীজপত্রী বীজ : যে সব বীজে একটিমাত্র বীজপত্র থাকে তাদেরকে একবীজপত্রী বীজ বলে। যেমন- পাট, ছোলা, আম, কাঁঠাল প্রভৃতি।

৩। বহুবীজপত্রী বীজ : যে সমস্ত বীজে দুই এর অধিক বীজপত্র থাকে তাদেরকে বহুবীজপত্রী বীজ বলে। যেমন- পাইন বীজ।

ভ্রূণের সংখ্যা অনুসারে

১। একভ্রূণী বীজ : যে সব বীজে একটিমাত্র ভ্রূণ থাকে, তাদেরকে একভ্রূণী বীজ বলে। যেমন- ধান, পাট গম

২। বহুভ্রূণী বীজ : যে সকল বীজে একাধিক ভ্রূণ থাকে এবং প্রতিটি ভ্রূণ এক একটি আলাদা গাছের জন্ম দিতে পারে, তাদেরকে বহুভ্রূণী বীজ বলে। যেমন–আম, লেবু ইত্যাদি।

নিষিক্ততা অনুসারে

১। নিষিক্ত বীজ ঃ পরাগরেণু দ্বারা ডিম্বক নিষিক্ত হয়ে যে বীজ উৎপন্ন হয়। তাকে নিষিক্ত বীজ বলে। যেমন- ধান, গম, সরিষা, ইত্যাদি।

২। অনিষিক্ত বীজ ঃ পরাগরেণু দ্বারা ডিম্বক নিষিক্ত না হয়েই যে বীজ উৎপন্ন হয় তাকে অনিষিক্ত বীজ বলে। যেমন- লেবু, জাম্বুরা,কমলা ইত্যাদি।

শস্যের Endosperm উপস্থিতি অনুসারে

১। সস্যল বীজ : যে সব বীজের ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্য বীজপত্রের বাইরে খাদ্য হিসেবে সস্য জমা থাকে তাদেরকে সস্যল বীজ বলে। যেমন– ধান, গম, ভূট্টা প্রভৃতি।

২। অস্যল বীজ : যে সকল বীজে ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্য বীজ পত্রের বাইরে সস্য জমা থাকে না তাদেরকে অসস্যল বীজ বলে। যেমন– ছোলা, কুমড়া ইত্যাদি।

বাংলাদেশ বীজ বিধি অনুযায়ী

বাংলাদেশ বীজ বিধি অনুযায়ী বীজকে ৪টি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। যথা–

(ক) মৌল প্রজননবিদ বীজ (Breeder seed)

(খ) ভিত্তি বীজ (Foundation seed)

(গ) নিবন্ধিত বীজ (Registered seed)

(ঘ) প্রত্যায়িত বীজ (Certified seed)

(ক) মৌল প্রজননবিদ বীজ (Breeder seed): অনুমোদিত বীজ উৎপাদন প্রক্রিয়ার প্রথম ধাপ হচ্ছে মৌল বীজ। উদ্ভিদ প্রজনন প্রতিষ্ঠানে কোন প্রজননবিদের ঘনিষ্ঠ ও সরাসরি তত্ত্বাবধানে উৎপাদিত সর্বাধিক বংশগত বিশুদ্ধতা সম্পন্ন বীজকে মৌল বীজ বলে।

(খ) ভিত্তি বীজ (Foundation seed): মৌল বীজের বিস্তার ঘটানোর জন্য ভিত্তি বীজের উৎপাদন করা হয়। বীজ অনুমোদনকারী সংস্থা কর্তৃক অনুমোদিত বীজ উৎপাদনের নিয়মনীতি অনুসরণ করে প্রজননবিদ বা কৃষিতত্ত্ববিদের সরাসরি তত্ত্বাবধানে মৌল বীজ থেকে উৎপাদিত বীজকে ভিত্তি বীজ বলে।

(গ) নিবন্ধিত বীজ (Registered seed): ভিত্তিবীজ থেকে উৎপাদিত বীজকে নিবন্ধিত বীজ বলে। বীজ বর্ধন খামার বা জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত কোন ব্যক্তিগত খামারের এ বীজ বর্ধন করা হয়।

(ঘ) প্রত্যায়িত বীজ (Certified seed): চুক্তিবদ্ধ চাষীর মাধ্যমে বীজ উৎপাদনের নিয়মনীতি মেনে ও জাতের বংশগত বিশুদ্ধতা রক্ষা করে ভিত্তি বীজ থেকে প্রত্যায়িত বীজ উৎপাদন করা হয়। পরে বীজ প্রত্যায়নকারী সংস্থা (Seed Certification Agency) পরীক্ষা করে অনুমোদন প্রদান করার পর এ বীজ প্রত্যায়িত বীজ হিসেবে চাষীদের মাঝে ব্যবহারের জন্য সরবরাহ করা হয়।

সারমর্ম

উদ্ভিদের বংশবিস্তারের মৌলিক উপকরণ হলো বীজ। কোন ফসলের ভালো ফলন পেতে হলে অবশ্যই ভালো বীজ ব্যবহার করতে হবে। বীজকে বিভিন্নভাবে শ্রেণীকরণ করা যায়। বাংলাদেশ বীজ বিধি অনুযায়ী বীজকে ৩টি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। যথা– মৌল বীজ, ভিত্তি বীজ ও প্রত্যায়িত বীজ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ২.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। পাথরকুচির পাতা কি ধরনের বীজ ?

(ক) উদ্ভিদতাত্ত্বিক (খ) কৃষিতাত্ত্বিক

(গ) উভয়ই (ঘ) কোনটিই নয়

২। প্রজননবিদের সরাসরি তত্ত্বাবধানে উৎপাদিত বীজকে কী বলা হয় ?

(ক) মৌল বীজ (খ) ভিত্তি বীজ
(গ) নিবন্ধিত বীজ (ঘ) প্রত্যায়িত বীজ

৩। ভালো বীজের আর্দ্রতা শতকরা কতভাগ থাকবে?
(ক) ২০% এর নিচে (খ) ২০% এর উপরে
(গ) ১২% (ঘ) ১২% এর উপরে।

৪। বাংলাদেশ বীজবিধি অনুযায়ী বীজকে কয় শ্রেণীতে ভাগ করা হয়?
(ক) ২ (খ) ৪
(গ) ৬ (ঘ) ৮

পাঠ-২.২ : বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণ

এ পাঠ শেষে আপনি–

- বীজ উৎপাদনের কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বীজ উৎপাদনের জন্য উপযোগী জমি নির্বাচন করতে পারবেন।
- বীজ প্রক্রিয়াকরণ সম্পর্কে ধারণা লাভ করবেন।
- বীজ সংরক্ষণের সাধারণ নীতিমালা জানতে পারবেন।

বীজ উৎপাদনের কৌশল

ফসলের ভালো ফলন পেতে গেলে ভালো বীজ উৎপাদনের বিকল্প নেই। সাধারণ ফসল উৎপাদনের চেয়ে বীজ ফসল উৎপাদন পদ্ধতি কিছুটা আলাদা। বীজ ফসল উৎপাদন করতে বিশেষ কিছু পরিচর্যা ও যত্ন নেয়া প্রয়োজন। আমরা এই বীজ ফসল থেকেই খাওয়ার জন্য ফসল উৎপাদন করে থাকি। এই বীজ ফসল উৎপাদন করতে গেলে কিছু কৌশল অনুসরণ করতে হয় যা নিচে আলোচনা করা হলো।

স্থান নির্বাচন : ভালো মানের বীজ উৎপাদনের জন্য প্রচুর সূর্যালোক, মাঝারি বৃষ্টিপাত, শুষ্ক ও ঠান্ডা আবহাওয়া এবং পরাগায়নের সময় হালকা বাতাস প্রবাহিত হয় এমন ধরনের স্থান নির্বাচন করা উচিত।

জমি নির্বাচন : জৈব পদার্থ সমৃদ্ধ উর্বর সমতল ভূমি যেখানে পরিমিত আলো বাতাস বিরাজমান এবং আগাছার প্রকোপ কম এমন জমি নির্বাচন করতে হয়। কোন জমিতে একাধিক বার একই জাতের ফসল চাষ না করাই শ্রেয়।

বীজ সংগ্রহ : অবশ্যই বীজ অনুমোদনকারী সংস্থা কর্তৃক অনুমোদিত বীজ সংগ্রহ করতে হবে। যেমন- প্রত্যায়িত বীজ উৎপাদনের জন্য ভিত্তি বীজ, ভিত্তি বীজের জন্য মৌল বীজ সংগ্রহ করতে হয়। সংগ্রহের সময় বীজের বস্তা বা প্যাকেটের ট্যাগে জাতের নাম, ব্যবহারের সময়সীমা, গজাবার ক্ষমতা, আর্দ্রতা, বীজ পরীক্ষার তারিখ ইত্যাদি তথ্যগুলো সঠিক আছে কিনা তা অবশ্যই খেয়াল করতে হবে।

বীজহার : গজাবার ক্ষমতা, বিশুদ্ধতা, বপনের সময়, মাটির উর্বরতা প্রভৃতি বিবেচনা করে নির্দিষ্ট পরিমাণ জমিতে কি পরিমাণ বীজ লাগবে তা নির্ধারণ করে নিতে হবে।

জমি প্রস্তুতকরণ : বিভিন্ন জাতের বীজ ফসলের জন্য বিভিন্নভাবে জমি তৈরি করতে হয়। যেমন- ধানের জমি শুকনো অবস্থায় ৪-৬ বার চাষ মই দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে ও সমান করে নিতে হয়। আবার রোপা ধানের জমি পানি দিয়ে ভিজিয়ে কাদা করে প্রস্তুত করতে হয়।

বীজ বপনের সময় ও পদ্ধতি : নির্বাচিত বীজ সঠিক সময়ে সারিতে বা ছিটিয়ে প্রায় গভীরতায় বুনতে হয়। বীজ সারিতে বপন করাই শ্রেয়। এতে আলো, বাতাস সহজে পায়, পরিচর্যা সহজ হয় এবং বীজও কম লাগে। তবে বপনের গভীরতা, বীজের আকার, মাটির বুনট ও আর্দ্রতা প্রভৃতির উপর বপনের সফলতা নির্ভর করে।

স্বতন্ত্রিকরণ/ পৃথকীকরণ দূরত্ব : নির্ধারিত জমির আশে পাশে একই বা ভিন্ন জাতের ফসলের সাথে যাতে বীজ ফসলের অনাকাঙ্ক্ষিত সংমিশ্রণ না ঘটে সেজন্য নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখতে হয়। যেমন– ধানের ভিত্তি বীজের বেলায় প্লট থেকে প্লটের স্বতন্ত্রিকরণ ৯ মিটার এবং প্রত্যায়িত বীজের ক্ষেত্রে ৫ মিটার রাখা হয়।

বাছাইকরণ/রোগিং : ভালো বীজ বপন করলেও গজাবার পর কিছু অন্য জাতের ফসল জন্মাতে দেখা যায়। জাতের বংশগত বিশুদ্ধতা রক্ষার স্বার্থে জমিতে ঘুরেফিরে এসব গাছ তুলে ফেলতে হয়। একেই রোগিং বলে। ফুল আসার আগেই এ কাজটি করা উত্তম। তবে তিন পর্যায়ে এ কাজটি করা যেতে পারে। যথা–

ক. গাছে ফুল আসার আগে,

খ. ফুল আসার সময় এবং

গ. পরিপক্ব হওয়ার পূর্বে।

পরিচর্যা : প্রয়োজনমাফিক সার ও পানি সেচের ব্যবস্থা করতে হবে। জলাবদ্ধতা দেখা দিলে প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি বের করে দিতে হবে। এ ছাড়া আগাছা হলে তা নিড়ানি দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে এবং পোকা মাকড় ও রোগবালাই দেখা দিলে তা দমন করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।

বীজ সংগ্রহ : ভালোভাবে পরিপক্ব হওয়ার পর বীজ ফসল কাটতে হবে। তারপর মাড়াই করে ঝেড়ে পরিষ্কার করে নিতে হবে।

প্রক্রিয়াজাতকরণ : কর্তনকৃত বীজ ফসল সঠিক স্থানে নিয়ে এসে মাড়াই করার পর বীজ পরিষ্কার করে নিতে হবে। এ সময় অবশ্যই বীজ থেকে অন্য ফসলের বীজ, অন্য জাতের বীজ, আগাছা বীজ, খড়কুটা, ভাঙ্গা দানা প্রভৃতি বেছে নিতে হবে। এরপর আবার ঝাড়াই করে নিয়ে ভালোভাবে শুকিয়ে সংরক্ষণ করতে হবে। সংরক্ষণের সময় বীজের আর্দ্রতা ১২% এর উপর এবং ৪% এর নিচে গেলে সজীবতা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। সুতরাং বীজের আর্দ্রতা ৪-১২% এর মধ্যে হলে বেশিদিন সংরক্ষণ করা যায়।

মনে রাখতে হবে, বীজের আর্দ্রতা শতকরা ১২ ভাগের বেশি হলে পোকা-মাকড় ও রোগবালাই আক্রমণের সম্ভাবনা বেশি থাকে।

বীজ সংরক্ষণের নীতি : বীজ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে সাধারণত : নিচের নীতিগুলো মেনে চলা হয়–

ক. বীজ রাখার জায়গা শুষ্ক ও ঠান্ডা হতে হবে।

খ. সংরক্ষণের আগে বীজ পরপর কয়েকদিন ভালোভাবে শুকিয়ে নিতে হবে ও পরে ছায়ায় ঠান্ডা করে নিতে হবে।

গ. সহজে সজীবতা হারায় না এমন ধরনের উন্নতমানের বীজ বায়ু নিরোধক ধাতব পাত্র বা পলিথিনের বস্থায় সংরক্ষণ করতে হবে।

ঘ. বীজ রাখার জায়গা পোকা ও রোগের আক্রমণের প্রতিরোধক হতে হবে।

ঙ. মাঝে মাঝে বীজ পরীক্ষা করে দেখতে হবে এবং প্রয়োজনে শুকিয়ে নিতে হবে।

চ. মোদ্দা কথা বীজ রাখার জায়গাতে বীজের স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবস্থা অটুট রাখতে হবে।

সারমর্ম

ভালো ফসলের জন্য অবশ্যই ভালো বীজের প্রয়োজন। এই ভালো বীজ উৎপাদনের কিছু কৌশল আছে। যথা– স্থান নির্বাচন, জমি নির্বাচন, বীজ সংগ্রহ, পরিচর্যা বীজ সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াকরণ। বীজ সংরক্ষণের অর্থ জীবনের সংরক্ষণ। বীজ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে কিছু নীতিমালা অনুসরণ করতে হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন–২.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিনঃ

১। প্রত্যায়িত বীজ উৎপাদনের জন্য কী বীজ সংগ্রহ করতে হয়?

(ক) মৌল বীজ (খ) ভিত্তি বীজ

(খ) নিবন্ধিত বীজ (ঘ) সবগুলোই

২। বীজ ফসলে কোন সময় রোগিং করা উত্তম ?

(ক) ফুল আসার সময় (খ) পরিপক্ব হওয়ার আগের সময়

(গ) ফুল আসার আগে (ঘ) কোনটিই নয়

৩। বীজ সংরক্ষণ করার জায়গা কেমন হওয়া উচিত ?

(ক) শুধু শুষ্ক (খ) শুধু ঠান্ডা

(গ) অত্যধিক গরম (ঘ) শুষ্ক ও ঠান্ডা

৪। সংরক্ষণের সময়বীজের আর্দ্রতা কত হওয়া উচিত?

(ক) ১–৪% (খ) ৪–৮%

(গ) ৪–১২% (ঘ) ৮–১৬%

পাঠ-২.৩ : সমন্বিত বালাই দমন ব্যবস্থাপনা

এ পাঠ শেষে আপনি–

- ফসলের বিভিন্ন আপদের নাম উল্লেখ করতে পারবেন।
- আপদের সংজ্ঞা দিতে পারবেন।
- সমন্বিত বালাই দমন ব্যবস্থাপনার উপকারিতা জানতে পারবেন।
- সমন্বিত বালাই দমন ব্যবস্থাপনার উপাদানসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- সমন্বিত বালাই দমন ব্যবস্থাপনা সম্বন্ধে বিস্তারিত লিখতে পারবেন।

আপদের সঠিক কোন সংজ্ঞা দেয়া যায় না কারণ এটা বিভিণ্নভাবে পরিবর্তনশীল। তবু ব্যাপক অর্থে যে কোন প্রাণী বা উদ্ভিদ যা মানুষ, তাদের পালিত পশু–পাখি, ফসল, ব্যবহৃত দ্রব্যাদি প্রভৃতির ক্ষতিসাধন করে বা বিরক্তির উদ্রেক করে থাকে তাকে আপদ বা বালাই বলা হয়। যেমন– পোকামাকড়, ইদুরজাতীয় প্রাণী, শিয়াল, পাখি, কাঠবিড়ালি, ছত্রাক, ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, কৃমি, আগাছা ইত্যাদি। ফসল বিবেচনা করলে আপদসমূহের মধ্যে পোকামাকড়ের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি।

সমন্বিত বালাই দমন ব্যবস্থাপনা

সমন্বিত বালাই দমন ব্যবস্থাপনা হলো উদ্ভিদ সংরক্ষণের এমন একটি পদক্ষেপ যার মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকার দমন পদ্ধতির সমন্বয় সাধন ও প্রয়োগ করে এবং কৃষি পরিবেশের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াকে ন্যূনতম পর্যায়ে রেখে আপদসমূহকে ধ্বংস করতে যে পরিমাণ অর্থ খরচ হয় তার চেয়ে বেশি মূল্যের ফসল পাওয়া। এ পদ্ধতিতে কম পরিমাণ বালাই শস্য পরিবেশে থাকবে। কম পরিমাণ বালাই এর আক্রমণে ফসলের প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে এবং ফসলের বৃদ্ধি ও ফলনে সহায়তা করে। কোন সময় আক্রমণ বেশি হলে শস্য নিজের ক্ষমতায় ক্ষতি পুষিয়ে নিতে পারে। শুধু একটি মাত্র পদ্ধতির দ্বারা বালাই দমন শস্য পরিবেশে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হতে পারে। যেমন– ব্যাপকহারে কীটনাশক ব্যবহারে ক্ষতিকর পোকামাকড় ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে উপকারী পোকা–মাকড়, ব্যাঙ প্রভৃতি ধ্বংস হয়। এতে প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায়। এজন্য সমন্বিত বালাই দমন ব্যবস্থাপনার মূলনীতি বা মূল উদ্দেশ্য হলো পোকামাকড় সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস নয় বরং অর্থনৈতিক ভাবে ক্ষতিকর পর্যায়ের নিচে রাখা। আমরা যদি সংক্ষেপে সমন্বিত বালাই দমন ব্যবস্থাপনার উপকারিতা জানতে চাই তাহলে দাঁড়ায়–

১. প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে।
২. উপকারী পরভোজী বা পরজীবী পোকামাকড়, ব্যাঙ প্রভৃতি সংরক্ষণ সহায়তা করে।
৩. পরিবেশ দূষণ কমিয়ে আনে বা রোধ করে।
৪. আপদনাশকের ব্যবহার কমিয়ে আনে।
৫. শস্যের প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়।
৬. ক্ষতিকর পোকামাকড় কীটনাশকের প্রতি প্রতিরোধী হওয়ার সুযোগ কম পায়।
৭. কম খরচে বেশি ফলন পাওয়া যায়।

সমন্বিত বালাই দমন ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন দমন পদ্ধতি যেমন– আধুনিক চাষাবাদ পদ্ধতি, প্রতিরোধক শস্য, যান্ত্রিক, জৈবিক, রাসায়নিক প্রভৃতির মধ্যে যখন যেটি প্রযোজ্য তা সঠিকভাবে ব্যবহার করা। নিচে সংক্ষেপে কয়েকটি দমন পদ্ধতি আলোচনা করা হলো :

আধুনিক চাষাবাদ পদ্ধতি

তীব্র রোগের সময় জমি গভীরভাবে চাষ দিলে নিচের পোকামাকড় ও তাদের ডিম উপরে উঠে আসাতে পাখি তা খেয়ে ফেলে এবং রোদে শুকিয়ে পোকা মারা যায়। এছাড়া একই জমিতে বার বার একই ফসল চাষ না করে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন ফসল চাষ করলে পোকামাকড় ও রোগবালাই এর আক্রমণ কম হয়। সঠিক মাত্রায় সার ব্যবহারে ফসল ঠিকভাবে বেড়ে উঠতে রোগ ও পোকার আক্রমণ কম হয়। ধান ক্ষেত থেকে পানি অপসারণ করে চুঙ্গি ও গাছ ফড়িং পোকার আক্রমণ কমানো যায়। আবার পানি সেচ দিয়ে ধানের শীষ কাটা লেদাপোকা ও পাটের উরচুঙ্গার আক্রমণ রোধ করা যায়।

প্রতিরোধক শস্য

ফসলের কিছু জাত আছে যেগুলেতে অনেক পোকা ও রোগ কোন ক্ষতি করতে পারে না। যেমন– চান্দিনা জাতের ধান মাজরা পোকার আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারে। আবার প্রগতি জাতের ধানে টুংরো, ব্লাস্ট ও বাকানী রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা আছে।

যান্ত্রিক দমন

এ পদ্ধতিতে পোকামাকড় হাত দ্বারা আহরণ করে, হাতজাল ও থলে ব্যবহার করে, পিটিয়ে ও খুঁচিয়ে, ঝাঁকিয়ে, চালুনি দ্বারা চেলে ও কুলা দ্বারা ঝেড়ে, প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, আলোর ফাঁদ ব্যবহার করে, পুঁড়িয়ে, রোদ ব্যবহার করে প্রভৃতির মাধ্যমে পোকামাকড় ধ্বংস করা হয়।

জৈবিক দমন

এ পদ্ধতির মূল বিষয়ই হলো জীব দ্বারা জীবের নিয়ন্ত্রণ। ক্ষতিকর কীটপতঙ্গের প্রাকৃতিক শত্রুসমূহ যেমন– পরভোজী বা পরজীবী পোকা, রোগজীবাণু প্রভৃতির সংখ্যা বাড়িয়ে তাদের দ্বারাই দমন করা হয়।

রাসায়নিক দমন

অনুমোদিত আপদনাশক ব্যবহার করে বালাই দমন করা হয়। যেমন- উদ্ভিদভোজী অধিকাংশ পোকা দমনে ডায়াজিনন ৬০ ইসি ব্যবহার করা হয়।

সমন্বিত বালাই দমন ব্যবস্থাপনার উপাদানসমূহ

সমন্বিত বালাই দমন ব্যবস্থাপনা ফসল ভিত্তিক হয়ে থাকে। একটি ফসল উৎপাদনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন দমন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। শস্যের বিভিন্ন পর্যায়ে যেমন– চারা অবস্থা, বর্ধিত পর্যায়, ফুল ও ফল ধরার পর্যায়ে পোকামাকড় ও রোগ আক্রমন করতে পারে।

সমন্বিত দমন ব্যবস্থাপনায় এসব পর্যায়ে যখন বালাই দেখা যাবে তখনই উপযুক্ত দমন পদ্ধতির দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। এ ব্যবস্থাপনার প্রধান ৫টি উপাদান নিচে উল্লেখ করা হলো :

১. পর্যবেক্ষণ : ফসলের ক্ষেতে বালাই এর আক্রমণ হয়েছে কিনা তা মাঝে মাঝে পরীক্ষা করা।

২. জরিপ : ফসলের ক্ষেতে বালাই ও তাদের প্রাকৃতিক শত্রু শনাক্তকরণ এবং এদের সংখ্যার ঘনত্ব জরিপ করা।

৩. দমননীতি : ফসলের জমিতে কখন ও কী পদ্ধতিতে বালাই দমন করতে হবে সে সম্পর্কে জানা ও সিদ্ধান্ত নেয়া।

৪. দমন পদ্ধতি : বিভিন্ন দমন পদ্ধতি যেমন– যান্ত্রিক, রাসায়নিক, জৈবিক প্রভৃতির মধ্যে যখন যেটি প্রযোজ্য তা ব্যবহার করা।

৫. অজীবীয় উপাদান ঃ ফসল উৎপাদনের সময় আবহাওয়া যেমন- তাপমাত্রা, আর্দ্রতা, কুয়াশা, বাতাসের বেগ প্রভৃতি বালাইয়ের উপর যে বিরূপ প্রভাব ফেলে তার উপর ভিত্তি করে দমন ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। কারণ প্রতিকূল আবহাওয়ায় অনেক বালাই প্রাকৃতিকভাবেই নিয়ন্ত্রিত হয়। এসব ক্ষেত্রে অন্য কোন দমন পদ্ধতি প্রয়োগের প্রয়োজন পড়ে না।

সারমর্ম

সমন্বিত বালাই দমন ব্যবস্থাপনা হলো উদ্ভিদ সংরক্ষণের একটি পদক্ষেপ যেখানে বিভিন্ন প্রকার দমন পদ্ধতির সমন্বয় সাধন ও প্রয়োগ করাকে বুঝায় অর্থাৎ যখন যে পদ্ধতির দরকার সেটির ব্যবহার বুঝায়। এ ব্যবস্থাপনার মূল উদ্দেশ্য হলো পোকামাকড় সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস নয় বরং অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিকর পর্যায়ের নিচে রাখা হয়। এ ব্যবস্থাপনা শস্যভিত্তিক হয়ে থাকে। এর প্রধান উপাদান ৫টি। যথা– পর্যবেক্ষণ, জরিপ, দমননীতি, দমন পদ্ধতি ও অজীবীয় উপাদান।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন–২.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। ফসলে কোন আপদটি সবচেয়ে বেশি দেখা যায়?

(ক) পোকামাকড় (খ) ইঁদুর

(খ) কৃমি (ঘ) আগাছা

২। যান্ত্রিক দমন পদ্ধতি কোনটি?

(ক) কীটনাশক ব্যবহার (খ) আলোর ফাঁদ ব্যবহার

(গ) সঠিক মাত্রায় সার ব্যবহার (ঘ) প্রতিরোধক শস্য ব্যবহার

৩। জৈবিক দমন পদ্ধতি কোনটি?

(ক) হাতদ্বারা দমন (খ) পুড়িয়েদমন

(গ) গভীরভাবে জমি চাষ করে (ঘ) কীটপতঙ্গের প্রাকৃতিক শত্রু দ্বারা

৪। সমন্বিত বালাই দমন ব্যবস্থাপনার প্রধান উপাদান কয়টি?

(ক) ৪টি (খ) ৫টি
(গ) ৬টি (ঘ) ৭টি

পাঠ- ২.৪ : ইঁদুর দমন

এ পাঠ শেষে আপনি–

- ইঁদুরের পরিচিতি বর্ণনা করতে পারবেন।
- ইঁদুর দমনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ইঁদুরের উপস্থিতির লক্ষণ বুঝতে পারবেন।
- ইঁদুর দমনের বিভিন্ন পদ্ধতির বিবরণ দিতে পারবেন।

ইঁদুর মেরুদন্ডী স্তন্যপায়ী প্রাণী। আপদ হিসেবে ইঁদুর মানুষের অন্যতম শত্রু এবং অতি প্রাচীনকাল থেকেই মানুষের সাথে পরিচিত। মাঠে ও গুদামে এরা ফসলের প্রচুর ক্ষতিসাধন করে থাকে। এ দেশে প্রতিবছর ইঁদুর দ্বারা সমস্ত ফসলের ১০-২০% ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এক জরিপে দেখা গেছে যে, প্রতিবছর এদেশে ইঁদুর দ্বারা ৩০০-৪৮০ কোটি টাকার ফসলসহ অন্যান্য সম্পদ নষ্ট হয়।

ইঁদুরের পরিচিতি ও স্বভাব

ইঁদুরের মুখের উভয় পাটিতে একজোড়া করে অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, ধারালো ও সদাবর্ধিষ্ণু ছেদন দাঁত থাকে। এই দাঁত দিয়ে এরা সব সময় কিছু না কিছু কাটাকাটি করে এবং দাঁতকে ক্ষয় করে। কাটাকাটি না করলে ছেদন দাঁতগুলো বেড়ে যায়। ফলে আর কিছুই খেতে পারে না। মানুষের দেহে ইঁদুর মারাত্মক প্লেগ রোগ ছড়ায়। কৃষিক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রজাতির যে সমস্ত ইঁদুর ক্ষতির ভূমিকা পালন করে তার একটি তালিকা দেয়া হলো :

১. কালো মেঠো ইঁদুর;
২. বড় কালো মেঠো ইঁদুর;
৩. গেছো ইঁদুর;
৪. মাঠের নেংটি ইঁদুর;
৫. সোলই বা ঘরের নেংটি ইঁদুর;
৬. নরওয়ে বা বাঁদামী ইঁদুর;
৭. নরম পশমযুক্ত ইঁদুর।

ইঁদুর যেকোন সময় গর্ভধারণ ও বাচ্চা দিতে পারে। অতিরিক্ত ঠান্ডা ও গরমে এদের জন্মহার কমে যায়। অনুকূল পরিবেশে একজোড়া ইঁদুর থেকে কয়েকটি প্রজন্মের মাধ্যমে বছরে এদের মোট সংখ্যা ৮০০-১০০০ এ গিয়ে দাঁড়ায়। এদের গর্ভকাল মাত্র ২২ দিন। মা ইঁদুর বাচ্চা প্রসবের ২/৩ দিন পর আবার গর্ভধারণ করে। ইঁদুরের দর্শন শক্তি অত্যন্ত দুর্বল। তবে এদের শ্রবণ, ঘ্রাণ ও স্বাদ ইন্দ্রিয় খুব উন্নত। গর্ত করা, গাছে চড়া, লাফ দেয়া ও সাঁতার কাঁটা অনেক ইঁদুরের অভ্যাস। কিছু কিছু ইঁদুর মেঝে থেকে প্রায় ১ মিটার উর্ধ্বে লম্বভাবে লাফ দিতে সক্ষম। এ জন্য এরা সব সময় পরিবেশের উপর নির্ভর করে বসবাসের স্থান পরিবর্তন করে। ইঁদুর খায় না এমন জিনিস কম। প্রতি রাতে এরা শরীরের ওজনের প্রায় ১০% খাদ্য খায়। লুকিয়ে খেতে খুব পছন্দ করে। তাই আমরা সাধারণত এদের দেখতে পাই না। এদের উপস্থিতির লক্ষণ দেখেই বুঝতে হয় ইঁদুর আছে কিনা।

ইঁদুরের উপস্থিতির চিহ্ন

১. **বাসা :** ধান ক্ষেত, ঝোপ-ঝাড়, ছাদ বা মাটির নিচে ইঁদুর গোলাকার বাসা তৈরি করে।

২. **গর্ত :** ঘর, বাড়ি ও ক্ষেতে ইঁদুরের টাটকা গর্ত দেখে এদের উপস্থিতি বুঝা যায়।

৩. **পায়ের চিহ্ন :** কাদা বা বালি মাটিতে এদের পায়ের ছাপ দেখা যায়।

৪. **ক্ষতির চিহ্ন :** কাটা শস্যগাছ, কাটা ফল বা কাটা বস্তা দেখেও এদের উপস্থিতি বুঝা যায়। কারণ এরা সবসময় তেরছা করে কাটে।

৫. **চলার পথ :** ইঁদুর সাধারণত: একই পথ দিয়ে চলাচল করে এবং তাদের চলার পথ অত্যন্ত পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখে।

৬. **পায়খানা :** বিভিন্ন জায়গায় ইঁদুরের পায়খানা দেখেও তাদের উপস্থিতি বুঝা যায়।

৭. **শব্দ :** বাড়ী-ঘরে রাতের বেলায় ইঁদুর দৌড়ানোর ও চলাফেরা করার শব্দে এদের উপস্থিতি টের পাওয়া যায়।

ইঁদুর দমন পদ্ধতি

ইঁদুর দমনের ক্ষেত্রে প্রথমেই আসে প্রতিনিয়ত তীক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ, সতর্ক দৃষ্টি ও পরিষ্কার–পরিচ্ছন্নতা। ইঁদুরের গতিবিধির উপর নিয়মিত সতর্ক দৃষ্টি রেখে পরিস্কার–পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে পারলে ইঁদুর দমনের অর্ধেক, অনেক ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ফলই পাওয়া যায়। এ জন্য নিয়মিত ইঁদুরের গতিবিধি ও উপস্থিতি খেয়াল করে প্রয়োজনীয় দমন ব্যবস্থা নিতে হয়। ইঁদুর দমন পদ্ধতি মূলত দুই ধরনের । যথা–

১. অরাসায়নিক দমন পদ্ধতি ও

২. রাসায়নিক দমন পদ্ধতি।

অরাসায়নিক দমন পদ্ধতি

১। শস্যদানা রাখার জন্য পাকা গুদামঘর বা ধাতব নির্মিত পাত্র ব্যবহার করতে হবে। এতে ইঁদুর ছিদ্র করে ভিতরে ঢুকতে পারবে না। গুদামের সমস্ত ছিদ্র সিমেন্ট বা টিনের পাত দ্বারা বন্ধ করে দিতে হবে।

২। বাড়িঘর, ক্ষেতের আইল পরিষ্কার–পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। এর ফলে ইঁদুর নিরাপত্তার অভাবে জায়গা ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যাবে। ক্ষেতের আইল সরু ও পরিষ্কার রাখলে ইঁদুর গর্ত করার সুযোগ পায় না।

৩। ঘরের ভিতর মাচার প্রতিটি খুঁটিতে একখন্ড করে মসৃণ টিন লাগাতে হবে। এতে ইঁদুর বেয়ে উঠতে পারে না।

৪। ঘরের সংগে লেগে থাকা গাছপালা কেটে দিতে হবে এবং মাটি থেকে ২ মিটার উঁচুতে গাছের কান্ডের চারপাশে ৪৬-৬১ সে.মি. প্রশস্ত টিনের মসৃন পাত লাগাতে হবে।

৫। ঘরে বা মাঠে ইঁদুর মারা ফাঁদ যেমন– স্প্রিং টাইপ, কেস টাইপ ইত্যাদি ব্যবহার করতে হবে। ফাঁদে শুটকি মাছ, চাল ভাজা, রুটি প্রভৃতি ব্যবহার করে ইঁদুরের রাস্তায় এ ফাঁদ রাখতে হয়।

৬। ইঁদুরের গর্ত খুঁড়ে বা গর্তে পানি অথবা ধোঁয়া দিয়ে ইঁদুর দমন করা যায়। গর্তের মুখে শুকনো মরিচ পুড়িয়ে ধোঁয়া দিলে ইঁদুর দ্রুত বের হয়ে আসে।

৭। বিড়াল পুষে বাড়ির ইঁদুর দমন করা যায়। এছাড়া বেজি, সাপ, কুকুর, চিল ও পেঁচা ইঁদুর খায়। এজন্য এসব প্রাণী বিনা কারণে মারতে নেই।

রাসায়নিক দমন পদ্ধতি

দুই ধরনের রাসায়নিক বিষ বিষটোপ হিসেবে ইঁদুর দমনে ব্যবহার করা হয়। যথা–

১. তীব্র বিষ ও

২. দীর্ঘস্থায়ী বিষ।

তীব্র বিষ (Acute poison) : তীব্র বিষের জন্য জিংক ফসফাইড বেশি ব্যবহৃত হয়। এ বিষ খাওয়ার সঙ্গে ইঁদুর মারা যায়। কিন্তু এ বিষ দ্বারা তৈরি টোপের প্রতি ইঁদুরের বিষটোপ লাজুকতা আছে। অর্থাৎ ইঁদুর কখনও সরাসরি পরিমিত বিষটোপ খায় না। প্রথমে একটু মুখে নিয়ে পরীক্ষা করে দেখে এবং যদি খারাপ লাগে তবে আর খায় না। এ জন্য এই লাজুকতা এড়াতে বিষ ছাড়া শুধু টোপ ২-৩ বার ব্যবহার কারার পর হঠাৎ বিষ মিশিয়ে দিতে হয়। ৪-৫ সপ্তাহ পর পর বিষ মিশিয়ে টোপ ব্যবহার করা এবং বিভিন্ন সময়ে টোপের দ্রব্যাদি বিভিন্ন রকম হওয়া উত্তম। ঘরবাড়িতে থাকে এমন ইঁদুরের মধ্যে এ ধরনের প্রবণতা বেশি। কিন্তু মাঠের কালো ইঁদুরের জন্য এ সমস্যা হয় না।

দীর্ঘস্থায়ী বিষ (Chronic poison) : দীর্ঘস্থায়ী বিষ হিসেবে রেকুমিন ব্যবহার করা হয়। এ ধরনের বিষ খেলে ইঁদুর ৬-৭ দিন পর মারা যায়। এ বিষ শরীরের ভিতর গেলে রক্তক্ষরণ হতে থাকে এবং ইঁদুর দ্যুর্বল হয়ে মারা যায়। বিষটোপের মাধ্যমে ইহা ব্যবহার করতে হয় এবং সবগুলো ইঁদুরকেই মারা সম্ভব হয়।

সতর্কতা

এ সব বিষ অত্যন্ত মারাত্মক বিধায় যে কোন প্রাণীর মৃত্যুর কারণ হতে পারে। তাই নিম্নোক্ত সতকর্তা অবলম্বন করতে হবে–

১। ঘরের বাইরে কোন নিরাপদ জায়গায় বিষটোপ তৈরি করতে হয়।

২। বিষটোপ সাবধানে ছেলেমেয়ে ও গবাদিপশুর নাগালের বাইরে রাখতে হবে।

৩। বিষটোপ তৈরির সময় নাক কাপড় দিয়ে বেঁধে রাখতে হবে যাতে বিষের পাউডার নাকে না ঢুকে।

৪। বিষটোপ তৈরির পর হাতমুখ ভালোভাবে সাবান দিয়ে ধুয়ে নিতে হবে।

৫। হঠাৎ বিষক্রিয়া দেখা দিলে আক্রান্ত ব্যক্তিকে বমি করানোর ব্যবস্থা নিতে হবে এবং জরুরি অবস্থায় ডাক্তারকে জানাতে হবে।

৬। ঘরে বা মাঠে বিষ ব্যবহারের সময় সম্ভাব্য সবাইকে জানাতে হবে।

সারমর্ম

ইঁদুর আমাদের অন্যতম শত্রু। এরা প্রতিবছর ফসলের শতকরা ১০-১২ ভাগ ক্ষতি করে থাকে। বিভিন্ন ধরনের ইঁদুর আমরা দেখতে পাই। যেমন– কালো মেঠো ইঁদুর, গেছো ইঁদুর, মাঠের নেংটি ইঁদুর, সোলই, বাঁদামী ইঁদুর প্রভৃতি। ইঁদুর খায় না এমন জিনিস খুব কম। এরা সব সময়ই কিছু না কিছু কাটাকাটি করে। পরিষ্কার–পরিচ্ছন্নতা ইঁদুর দমনের প্রধান শর্ত। রাসায়নিক ও অরাসায়নিক এ দু'পদ্ধতিতে ইঁদুর দমন করা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ২.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ( ) চিহ্ন দিন:

১। বাংলাদেশে ইঁদুর দ্বারা প্রতি বছর শতকরা কত ভাগ ফসল নষ্ট হয়?

ক. ৪০-৫০ ভাগ (খ) ৩০-৪০ ভাগ
(গ) ১০-১২ ভাগ (ঘ) ২-৩ ভাগ

২। ইঁদুর কী রোগ ছড়ায় ?

(ক) টাইফয়েড (খ) প্লেগ
(গ) কলেরা (ঘ) ম্যালেরিয়া

৩। কোন প্রাণী ইঁদুর খায় ?

(ক) পেঁচা (খ) কবুতর
(গ) ব্যাঙ (ঘ) ফিংগে

৪। জিংক ফসফাইড কী ধরনের বিষ ?

(ক) দীর্ঘস্থায়ী বিষ (খ) তীব্র বিষ
(গ) উভয়ই (ঘ) কোনটিই নয়

ব্যবহারিক

বিষয়- ১ : বীজের বিশুদ্ধতা নির্ণয়

এ পাঠ শেষে আপনি–

- বীজের বিশুদ্ধতার হার নির্ণয় করতে পারবেন।

উপকরণ : ১. বীজ, ২. নিক্তি, ৩. সাদা কাগজ, ৪. ক্যালকুলেটর, ৫. চিমটা, ৬. পেট্রিডিস

কাজের ধাপ

১। যে কোন একটি ফসলের কিছু বীজ মেপে নিন।

২। বীজগুলো একটা সমান জায়গায় সাদা কাগজের উপর ঢেলে নিন।

৩। বীজগুলের মধ্য থেকে কাঙ্ক্ষিত ফসলের বীজ বেছে নিয়ে মেপে নিন। ধরুন এর ওজন w গ্রাম।

৪। অন্য ফসলের বীজ বেছে নিয়ে মেপে নিন। ধরুন এর ওজন x গ্রাম।

৫। আগাছার বীজ বেছে নিয়ে মেপে নিন। ধরা যাক এর ওজন y গ্রাম

৬। জড়পদার্থও বেছে নিয়ে মেপে নিন। ধরুন এর ওজন z গ্রাম।

৭। এবার নিম্নের সূত্র ব্যবহার করে বীজের বিশুদ্ধতার হার বের করে নিন।

$$\text{mLP\r KmÊ°fJr yJr} = \frac{w \times 100}{w + x + y + z}$$

$$\text{Ijq lxPur mLP\r yJr} = \frac{x \times 100}{w + x + y + z}$$

$$\text{IJVJZJr mLP\r yJr} = \frac{y \times 100}{w + x + y + z}$$

$$\text{\z khJPgtr yJr} = \frac{z \times 100}{w + x + y + z}$$

৮। উপরিউক্ত কাজের ধাপগুলো অনুসরণ করে বীজের বিশুদ্ধতার হার, অন্য ফসলের বীজের হার, আগাছার বীজের হার ও জড়পদার্থের হার নির্ণয় করুন এবং ব্যবহারিক খাতায় কাজের বিবরণীসহ তা লিপিবদ্ধ করুন।

বিষয় ২ : ধানের বীজ বাছাই

এ পাঠ শেষে আপনি–

- ধানের ভালো বীজ বাছাই করতে পারবেন।

উপকরণ : ১. ধানের বীজ ২. বালতি ৩. পানি ৪. ইউরিয়া

কাজের ধাপ

১। কমপক্ষে ২০ লিটার পানি ধরে এরকম একটি বালতি নিন।

২। বালতির মধ্যে ১৩ লিটার পরিষ্কার পানি মেপে নিন।

৩। ১৩ লিটার পানির জন্য আধা কেজি ইউরিয়া সার মেপে নিয়ে তা বালতির পানিতে ভালোভাবে মিশিয়ে দিন।

৪। এবার ইউরিয়া সার মিশানো পানিতে ধানের বীজ ছেড়ে দিয়ে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করুন।

৫। লক্ষ্য করে দেখুন ভারী ও পুষ্ট বীজগুলো বালতির পানিতে ডুবে আছে এবং অপুষ্ট ও চিটা বীজগুলো ভেসে আছে।

৬। ভাসমান বীজগুলো হাত বা চালুনি দিয়ে তুলে ফেলুন।

৭। এরপর বালতির পানিতে ডুবে থাকা বীজগুলো তুলে পরিষ্কার পানিতে ২-৩ বার ভালো করে ধুয়ে ছায়ায় শুকিয়ে নিন। ধানের বীজ বাছাইয়ের জন্য এভাবে উপরিউক্ত কাজগুলো অনুশীলন করুন এবং ব্যবহারিক খাতায় তা লিপিবদ্ধ করুন।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সংক্ষিপ্ত ও রচনামূল প্রশ্ন

১। বীজ কি? ভালো বীজের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করুন।

২। বাংলাদেশে বীজবিধি অনুযায়ী বীজের শ্রেণীবিভাগের বিবরণ দিন।

৩। বীজ উৎপাদনের কৌশল বর্ণনা করুন।

৪। বীজ সংরক্ষণের সাধারণ নীতিগুলো উল্লেখ করুণ।

৫। শস্য সংরক্ষণ, আপদ ও সমন্বিত বালাই দমন ব্যবস্থাপনার সংজ্ঞা দিন।

৬। সমন্বিত বালাই দমন ব্যবস্থানার উপকারিতা ও উপাদানগুলোর আলোচনা করুন।

৭। ইঁদুরের স্বভাব-প্রকৃতির বর্ণনা দিন।

৮। ইঁদুর দমনের রাসায়নিক ও অরাসায়নিক পদ্ধতি ব্যাখ্যা করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ২.১ : ১। খ ২। ক ৩। গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ২.২ : ১। খ ২। গ ৩। ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ২.৩ : ১। ক ২। খ ৩। ঘ ৪। খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ২.৪ : ১। গ ২। খ ৩। ক ৪। খ